

কথাপ্রসঙ্গ

লেখক
আসিফ আদনান



সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ভূমিকা • ৯

সেকুলারিজম: নিরপেক্ষতার মুখোশ ও বাস্তবতা • ১১

নারীবাদ ও আধুনিকতা • ৫৬

শিক্ষা, ইতিহাস ও আধিপত্য • ৮০

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মডারেট ইসলাম প্রকল্প • ১১৬

কাতার বিশ্বকাপ ও দুই সভ্যতার সংঘাত • ১৪৬

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদ সা., তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

সিয়ান পাবলিকেশন আমার কিছু পডকাস্ট আলোচনার অনুলিপি বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের বিভিন্ন সময়ে কথাগুলো বলা হয়েছিল। ছাপার অক্ষরের উপযোগী করতে কোথাও সামান্য পরিমার্জন করা হলেও, যেভাবে বলা হয়েছিল মোটাদাগে সেভাবেই রাখা হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক আলাপ হওয়ায় তেমন কোনো রেফারেন্সও যুক্ত করা হয়নি।

লেখার টেবিলে লেখকের অবসর থাকে, চিন্তাকে ধাপে ধাপে সাজিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে। মুখে বলা কথায় সে সুযোগ মেলে না; চিন্তা সেখানে নিজের বেগে ছুটে চলে। তাছাড়া আলোচনাগুলো বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিরতিতে করা। তাই কিছু কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পাঠক নিশ্চয় বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

প্রথম দেখায় বিষয়গুলো আলাদা মনে হলেও এদের ভেতরে জড়িয়ে আছে একটি অভিন্ন সুতো। আমরা যে সময়, সভ্যতা ও শাসনকাঠামোর ভেতরে বাস করছি, তার বাস্তব রূপটি কেমন, আলোচনাগুলো তারই কিছু দিক সামনে এনেছে। যাতে চিন্তার জগতে এক ধরনের আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের ভিত্তি তৈরি হয়। যেন এই কয়েকটি প্রসঙ্গের বাইরে গিয়েও পাঠক এমন ছক নিজে ধরতে ও মোকাবিলা করতে শেখেন।

তবে আত্মরক্ষার সবচেয়ে মজবুত ভিত্তি হলো নিজের শেকড়ে ফেরা। কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফুস সালিহিনের বুঝ অনুযায়ী ইসলামকে আঁকড়ে ধরা। এই ভিত্তি থেকেই আসে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ফ্রেমওয়ার্ককে প্রশ্ন করার শক্তি আর সত্যিকারের আযাদীর তামাশা।

সেকুলারিজম : নিরপেক্ষতার মুখোশ ও বাস্তবতা^১

সেকুলারিজম কী এবং কী করে

সেকুলারিজমকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। অনেকেই একে বলেন ‘পলিসেমিক’ বা বহুমাত্রিক এক ধারণা—যার ভেতরে লুকিয়ে আছে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা। সেকুলারিজমের বিষয়টা ঠিক তেমনই, এর শাখা-প্রশাখাও ছড়িয়ে আছে নানা দিকে।

প্রথমত, সেকুলারিজম বলতে বোঝায় একটা সুনির্দিষ্ট মতবাদ, রাজনৈতিক ডকট্রিন বা রাজনৈতিক দর্শনকে।

সেকুলার রাষ্ট্র হলো সেই বাস্তব কাঠামো—যা এই রাজনৈতিক ডকট্রিনকে শাসনব্যবস্থায় কার্যকর করে।

আর সেকুলারাইজেশন হলো একটা ধারাবাহিক সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া—যার মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক একটা সমাজ ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষ, বা সহজ কথায় ধর্মহীন হয়ে ওঠে।

দুনিয়াজুড়ে সেকুলারিজমের নানা রূপ আর ধরন চোখে পড়ে। আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স কিংবা ভারত—প্রতিটা রাষ্ট্রকেই সেকুলার বলা হয়। অথচ বাস্তবে এই দেশগুলোর রাষ্ট্রকাঠামো আর প্রয়োগের ব্যবধান আকাশ-পাতাল, অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্য স্পষ্ট।

এসব কারণে সেকুলারিজমকে একটা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার আওতায় আনা কঠিন। পাশাপাশি, কেবল সংজ্ঞার আলোচনা থেকে সেকুলারিজমের বাস্তবতা বোঝাও প্রায় অসম্ভব। তাই আমি কয়েকটা দিক থেকে বিষয়টা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

১. ২০২১ সালে সেকুলারিজম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইতিহাস ও বাস্তবতা শিরোনামের পডকাস্ট থেকে অনুলিখিত

গতানুগতিক সংজ্ঞা

ক্লাসিক্যাল লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গিতে সেকুলারিজমের সবচেয়ে প্রচলিত যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তার বয়ানটা অনেকটা এরকম:

সেকুলারিজম নিজে কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ বা জীবনদর্শন না; এটা স্রেফ একটা নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামোগত ব্যবস্থা। ধার্মিক কিংবা অধার্মিক—যেকোনো মানুষই কোনো সংকট ছাড়া এটা গ্রহণ করতে পারে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও স্বাধীন সমাজ নিশ্চিত করা।

স্বাভাবিকভাবেই এমন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। এর সবচেয়ে বড় শর্ত হলো ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছেদ—’সেপারেশন বিটুইন চার্চ অ্যান্ড স্টেট’। শাসনকাঠামো থেকে ধর্মকে এখানে পুরোপুরি আলাদা রাখা হয়। এর সুবাদে প্রত্যেকে নিজের মতো করে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পায়, তবে শর্ত একটাই—কারো ধর্ম চর্চা যেন অন্যের স্বাধীনতায় কোনো আঘাত না হানো। প্রত্যেকে নিজের বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে, যতক্ষণ না তা অন্যের পরিসরকে লঙ্ঘন করছে।

সেকুলার রাষ্ট্রের আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এর আইন, শিক্ষা কিংবা কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধর্মের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে না। এগুলোর চালিকাশক্তি হবে তথাকথিত ‘সেকুলার রিজন্স’; অর্থাৎ বিজ্ঞান, যুক্তি ও সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মের মুখাপেক্ষী হওয়া যাবে না।

এর সাথে যুক্ত হয় ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে আইনের চোখে সবার সমান অধিকার আর বৈষম্যহীনতার নীতি—যা এই সেকুলার রাষ্ট্রকাঠামোর অন্যতম প্রধান ভিত হিসেবে কাজ করে।

রাষ্ট্র যখন মুফতি

ক্লাসিক্যাল লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গির এই সহজ-সরল বয়ানটা দীর্ঘকাল ধরে বাজারে চালু থাকলেও, খোদ পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়া থেকেই এর ওপর তীব্র সমালোচনা এসেছে। আর এই সমালোচনাগুলো তুলেছেন বাঘা বাঘা সব লিগ্যাল থিওরিস্ট, নৃবিজ্ঞানী আর ইতিহাসবিদরা।

তাদের মূল আপত্তিটা হলো: সেকুলার রাষ্ট্রকে নিছক ধর্ম ও রাষ্ট্রের মাঝখানে এক নিরপেক্ষ দেওয়াল হিসেবে দেখাটা একটা মারাত্মক খণ্ডিত ও অতি সরলীকৃত

নারীবাদ ও আধুনিকতা^১

নারীবাদের মূল শেকড় আধুনিকতাবাদ

নারীবাদকে আমরা প্রায়ই একটা বিচ্ছিন্ন সংকট হিসেবে দেখি। বাস্তবতা হলো, নারীবাদ কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় না; এটা আধুনিকতা নামের অনেক বড় আর পুরোনো সংকটের অনেক দিকের মধ্যে একটা দিক কেবল। যে গলদ আমরা নারীবাদে দেখি, আধুনিকতার গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিটা মতবাদের মধ্যে সেই একই গলদগুলো বিদ্যমান।

বাইরে থেকে এসব মতবাদকে আপাতদৃষ্টিতে বেশ নিরীহ, এমনকি ভালোও মনে হয়। কিন্তু এগুলো যখন ধীরে ধীরে কোনো সমাজে প্রচার পায়, বিস্তার লাভ করে এবং শেকড় গাড়ে, তখন তা সমাজকাঠামোয় নানা ধরনের পরিবর্তন আনতে শুরু করে। বিশেষ করে যেকোনো ঐতিহ্যবাহী (traditional) সমাজে এগুলো মানুষের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের ভিত্তিমূলকে বদলে দেয়।

এসব মতবাদ এমন সব চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের জন্ম দেয়, যা সরাসরি ইসলামি জীবনাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। একজন মুসলিম যখন নারীবাদের আদর্শ বা এর কোনো ধারণা নিজের মধ্যে ধারণ করেন, তখন তার চিন্তাজগতে চরম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তার ইমান এবং আধুনিক ধ্যানধারণার মধ্যে এক ধরনের সংঘাত তৈরি হয়। তাই আবারও বলছি, এটা কেবল নারীবাদের নিজস্ব কোনো সমস্যা না। আধুনিকতা থেকে আসা যেকোনো মতবাদের ক্ষেত্রেই এটা সত্য; তা হোক গণতন্ত্র, সেকুলারিজম কিংবা লিবারেলিজমের ছাতার নিচে থাকা অন্য কোন আদর্শই।

এমনকি এ কথা আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিজ্ঞানকে আমরা সাধারণত কিছুটা নিরপেক্ষ বলে ধরে নিই। কিন্তু মানুষ যখন বিজ্ঞানের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং কেবল সায়েন্টিফিক কমিউনিটির সব কথা ওপরই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে, তখন তারা এমন সব অবস্থান নেয়

১. ২৭ মার্চ ২০২২ সালে একটি আলোচনা থেকে অনুলিখিত।

যা আমাদের ঐতিহ্য, ফিকহশাস্ত্র বা ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়।

এর একটা বড় উদাহরণ আমরা দেখেছি করোনা মহামারির সময়। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সে সময় আমাদের মধ্যে দীনদার বলে পরিচিত অনেক মানুষ, সেলিব্রিটি ও বড় বড় লেখকরাও আলেমদের সমালোচনা করছিলেন। প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল—আলেমরা কেন মসজিদ বন্ধ করার ফতোয়া দিচ্ছেন না? কেন তাঁরা বলছেন, অসুস্থ বোধ করলে বা ভয় পেলে মসজিদে আসার প্রয়োজন নেই, কিন্তু মসজিদ খোলা রাখতে হবে? সে সময় অসংখ্য মানুষ আলেম-ওলামাদের তীব্র আক্রমণ করে কথা বলেছেন।

অথচ, আপনি যদি শরীয়াহর মূলনীতি ও ইসলামি ফিকহের অবস্থানের আলোকে দেখেন, তাহলে আলেমদের সেই অবস্থান সঠিক ছিল। আজকের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান বিশ্ব শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থানেই ফিরে এসেছে। সেদিন মসজিদ বন্ধ রাখার জন্য এত তোড়জোড় করা হলেও, শিল্পকারখানা বা অন্যান্য অনেক কিছুই কিন্তু ঠিকই চালু ছিল।

এই উদাহরণটা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো—যখনই আপনি আধুনিকতা থেকে উদ্ভূত কোনো মতবাদ বা আদর্শকে গ্রহণ করবেন, তা কোনো না কোনোভাবে আপনার ইমানকে প্রভাবিত করবে; যদিও শুরুতে তা বোঝা যায় না। নারীবাদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটা ঘটে। এটা হলো আমার প্রথম পয়েন্ট।

এর সাথেই আমার পরবর্তী পয়েন্টটা যুক্ত। তা হলো, নারীবাদ মূলত আধুনিকতারই (Modernity) একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখন প্রশ্ন হলো, আধুনিকতা আসলে কী? খুব সংক্ষেপে বললে—মডার্নিটি বা আধুনিকতা হলো ব্যক্তি, সমাজ, শাসনব্যবস্থা, মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি। মূলত মানবসমাজকে সংগঠিত করার এবং জীবনযাপনের এটা একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। এটাকে এক ধরনের ‘ওয়ার্ল্ডভিউ’ বা দীনও বলা যেতে পারে।

ষোলো শতক থেকে শুরু করে ইউরোপে ব্যক্তি, সমাজ, অর্থনীতি, অধিকার, সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা, প্রকৃতি, মহাবিশ্ব এবং স্রষ্টা সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট ধ্যানধারণার উৎপত্তি ঘটে। ইউরোপের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকেই এসব ধারণার জন্ম। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে এগুলো ধীরে

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মডারেট ইসলাম প্রকল্প^১

র‍্যান্ড, মডারেট ইসলাম, মডার্নিস্ট মুভমেন্ট—এসব নিয়ে বিভিন্ন সময় বেশ কথাবার্তা ওঠে। পক্ষে-বিপক্ষে তর্কও হয় প্রচুর। তবে আফসোসের ব্যাপারটা হলো, অনেকেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন ভাষা-ভাষা ধারণা থেকে, কিংবা একেবারেই না জেনে। এর ফলে আলোচনাগুলো হয়ে দাঁড়ায় নিতান্তই আবেগপ্রসূত এবং ফাঁপা। যথাযথ মূল্যায়নে পৌঁছানোর আগে এই বিষয়গুলোর পেছনের রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও আদর্শিক সমীকরণগুলো গভীরভাবে বোঝা দরকার।

ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রকল্প নতুন কিছু না। উপনিবেশ আমল থেকেই পশ্চিমা বিশ্ব এ চেষ্টা করে আসছে। এর পেছনে বেশ কিছু কারণও আছে। যেকোনো জনগোষ্ঠীকে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সবার আগে তাদের ভেতর থেকে সেই আদর্শটা মুছে দিতে হয়, যা তাদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামাতে পারে। নিজেদের দীর্ঘ ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পশ্চিমা এই সত্যটা ভালোভাবেই জানত। আর মুসলিমদের ক্ষেত্রে সেই চালিকাশক্তিটা হলো খোদ ইসলাম—ইসলামি শরিয়াহ ও ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজস্ব সভ্যতা বিনির্মাণের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রতিরোধম্পূহাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সবচেয়ে মোক্ষম উপায় হলো, ভেতর থেকে এর মূল আদর্শকে কলুষিত করে ফেলা। কাজটা অবশ্য সহজ না। প্রথমত, প্রশাসন আর শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো, যাতে সেখান থেকে বের হয়ে আসে আত্মপরিচয়হীন, মেরুদণ্ডভাঙা কিছু ‘বাদামি চামড়ার সাহেব’। উপনিবেশ আমলে পশ্চিমা ঠিক এই কাজটাই করেছে—মধ্যপ্রাচ্যে এবং উপমহাদেশেও।

কিন্তু স্রেফ এই প্রশাসনিক পরিবর্তনে লক্ষ্য পূরণ হয় না। ইসলামি অনুশাসনকে নিক্ষেপ করতে হলে আঘাতটা করতে হয় খোদ ইসলামি জ্ঞান ও চিন্তাকাঠামোর

১. জুন ১১, ২০২০ সালে প্রদত্ত একটি আলোচনা থেকে অনুলিখিত

ওপর। এই কাজটা পশ্চিমারা সরাসরি নিজেরা করতে পারে না। এর জন্য দরকার পড়ে এমন কিছু মানুষের, যারা নামে মুসলিম, হয়তো বিশ্বাসেও মুসলিম, কিন্তু পশ্চিমা দর্শন ও জীবনব্যবস্থায় তারা এতটাই অন্ধ যে, পশ্চিমের ছাঁচেই ইসলামকে নতুন করে সাজিয়ে নিতে চায়। জেনে কিংবা না জেনে, তারা আদতে প্রচার করে সেই সংস্করণটা, যা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের অনুগামী।

একেক সময়ে এদের একেক নামে ডাকা হয়েছে—রিফর্মিস্ট (সংস্কারবাদী) মুসলিম, মডার্নিস্ট (আধুনিকতাবাদী) মুসলিম কিংবা হাল আমলের মডারেট (মধ্যপন্থী) মুসলিম নামগুলো পশ্চিমাদেরই দেয়া। আর এগুলোর সবগুলোর মূল অর্থ একই: আগ্রাসী পশ্চিমের ইসলাম সংস্কার প্রজেক্টের স্বাভাবিক মিত্র।

আমেরিকার র্যান্ড কর্পোরেশনের যে ‘মডারেট ইসলাম’ প্রকল্প, সেটা মূলত উপনিবেশ আমল থেকে শুরু করা প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং আধুনিক সংস্করণ।

একটা সামরিক থিংক ট্যাংকের জন্ম

অনেকেই প্রশ্ন করেন—RAND আসলে কী? তাদের কেন এত গুরুত্ব দিতে হবে? অথবা, এটা আদৌ ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে কি না? আমি বিশ্বাস করি, এই প্রেক্ষাপটটা জানার পর এবং নিজেরা যাচাই করে দেখলে বিষয়টা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিজেরাই বুঝতে পারবেন, RAND-এর বক্তব্যগুলো আসলেই কতটা গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে। তাই আমি প্রথমে RAND Corporation-এর একটা পটভূমি তুলে ধরছি।

RAND Corporation-এর পূর্ণরূপ হলো ‘Research and Development’। ১৯৪৬ সালে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটা মূলত একটা গ্লোবাল পলিসি থিংক ট্যাংক। বলে রাখা ভালো, এটা কোনো সাধারণ এনজিও না। কয়েকজন সমাজসেবী মিলে এটা গড়ে তোলেনি। বরং, ১৯৪৬ সালে খোদ আমেরিকান বিমান বাহিনী এই RAND Corporation প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ইউএস এয়ার ফোর্স কেন এমন একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার নীতিনির্ধারক, রণকৌশলবিদ এবং সামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের জন্য সামনে আরও একটা বড় যুদ্ধ অপেক্ষা করছে। এই আসন্ন যুদ্ধটা কিছু কিছু দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

কাতার বিশ্বকাপ ও দুই সভ্যতার সংঘাত^১

কাতার বিশ্বকাপ চলছে। এটা নিয়ে বিশ্বজুড়েই তুমুল উত্তেজনা ও উন্মাদনা কাজ করছে; তবে আমাদের দেশে এর মাত্রা যেন একটু বেশিই। প্রতি চার বছর পর পর বিশ্বকাপ এলেই এমন উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তবে এবারের বিশ্বকাপের একটা বিশেষ দিক হলো, আয়োজক দেশ কাতারকে নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের প্রবল আপত্তি ও ক্ষোভ। তারা নানাভাবে এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

বিশ্বকাপ নিয়ে এই বিতর্কের পেছনে আসলে লুকিয়ে আছে অনেক বড় একটা বাস্তবতা—ইসলাম আর পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যকার এক গভীর, আপসহীন সংঘাত। আমাদের আলোচনা সেই সংঘাতের কিছু শেকড় নিয়ে। আমরা কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে বিতর্কটাকে ধরে এগোব, আর এর ভেতর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবো সেই সংঘাতের স্বরূপটা।

পশ্চিমের ক্ষোভ

কাতার বিশ্বকাপ শুরু হবার আগেই অনেক পশ্চিমা মিডিয়া এবং সেলিব্রিটি প্রকাশ্যে বিশ্বকাপ বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। টুর্নামেন্ট শুরুর পর বয়কটের সেই সুর কিছুটা স্তিমিত হলেও সমালোচনা থামেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিবিসি (BBC) প্রতিবাদস্বরূপ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেনি। খেলার মাঠেও প্রতিবাদের চিত্র দেখা গেছে: জার্মান দলের খেলোয়াড়রা মুখে হাত দিয়ে ছবি তুলে বাকস্বাধীনতার অভাব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এছাড়া, ব্রিটেনের বাসে থাকা কাতারি কোম্পানিগুলোর অনেক বিজ্ঞাপনও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পশ্চিমাদের এই ক্ষোভের পেছনে মূলত দুইটা কারণ তুলে ধরা হচ্ছে।

১. ডিসেম্বর ১৬, ২০২২ সালে প্রদত্ত একটি আলোচনা থেকে অনুলিখিত.

প্রথম ও প্রধান কারণটা হলো, পশ্চিমাদের চোখে কাতার রাষ্ট্র মানবাধিকার-বিরোধী। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তারা এলজিবিটিকিউ (LGBTQ)—অর্থাৎ সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার ইত্যাদি যৌন বিকৃতির অধিকারের কথা বোঝাচ্ছে, যা পশ্চিমা বিশ্বে স্বীকৃত। কাতার একটা মুসলিম ও আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়ায়, তাদের সমাজ ও আইনে এ ধরনের যৌন বিকৃতি সম্পূর্ণ অবৈধ এবং নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। এ কারণেই তারা বিশ্বকাপের জন্য কিছু কঠোর নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। কেউ যদি প্রকাশ্যে এ ধরনের কার্যক্রমে লিপ্ত হয় বা শারীরিকভাবে অন্তরঙ্গ হয়, তবে কাতারের আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

একইভাবে, স্টেডিয়ামের ভেতরে ও বাইরে প্রকাশ্যে মদ পান করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও ভিআইপি বক্স বা নির্দিষ্ট নাইট ক্লাবগুলোতে মদ পানের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু জনসমক্ষে তা অবৈধ। এছাড়া, সমকামিতার পক্ষের কোনো স্লোগান বা প্রতীকও কাতার অনুমোদন করেনি। যেমন, ‘ওয়ান লাভ’ (One Love) লেখা আর্মব্যান্ড পরার বিষয়ে কাতার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছে, যা পরে ফিফাও (FIFA) সমর্থন করেছে। পশ্চিমাদের মূল আপত্তি ঠিক এখানেই; তাদের মতে, এর মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

পশ্চিমাদের দ্বিতীয় অভিযোগটা অভিবাসী শ্রমিক বা মাইগ্রেন্ট লেবারারদের (Migrant Laborer) নিয়ে। কাতারের এই জাঁকজমকপূর্ণ স্টেডিয়ামগুলো নির্মাণে যারা কাজ করেছেন, তাদের বড় অংশই বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানের মতো দেশের শ্রমিক। পশ্চিমাদের দাবি, এই শ্রমিকদের অত্যন্ত মানবতর জীবনযাপন করতে হয়েছে, তারা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাননি এবং তাদের যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমন শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় আয়োজিত একটা বিশ্বকাপ তারা কেন সমর্থন করবে—এটাই তাদের প্রশ্ন।

তৃতীয় আপত্তিটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের বেশ পুরোনো একটা অভিযোগ, আর তা হলো নারী অধিকার। কাতারে নারীদের অধিকার নেই, তাদের বোরখায় আটকে রাখা হয়; এমন নানা অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে, এসবের পরও পশ্চিমারা ঠিক যে মাত্রায় ফ্লোভ প্রকাশ করছে, তার পুরোপুরি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে না।

এর বিপরীতে অনেকেই কিছু পাল্টা যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, পশ্চিমারা যে মানবাধিকারের কথা বলছে, তাদের নিজেদের